ছবি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

অষ্টম সংস্করণ

বং নিচে খেলা-ধূলা, নৃত্য-গীত ও আহার-বিহারের স্রোত রাত্রি-দিন অবিরাম বহিতে লাগিল। মনে হইল ইহার বুঝি আর শেষ হইবে না।

পিতৃ-শোকের এই উৎকট আনন্দ হইতে ক্ষণকালের জন্য কোন-মতে পলাইয়া বা-থিন একটা নির্জ্জন গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতে-ছিল, হঠাৎ চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, মা-শোয়ে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ওড়নার প্রান্ত দিয়া নিঃশব্দে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল এবং পাশে বসিয়া তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, বাবা মরিয়াছেন, কিন্তু তোমার মা-শোয়ে এখনও বাঁচিয়া আছে।

২

বা-থিন ছবি আঁকিত। তাহার শেষ ছবিখানি সে একজন সওদাগরকে দিয়া রাজার দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রাজা ছবিখানি গ্রহণ করিয়াছেন এবং খুসী হইয়া রাজ-হস্তের বহুমূল্য অঙ্গুরী পুরস্কার করিয়াছেন।

আনন্দে মা-শোয়ের চোখে জল আসিল, সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, বা-থিন জগতে তুমি সকলের বড় চিত্রকর হইবে।

বা-থিন হাসিল, কহিল, বাবার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করিতে পারিব।

উত্তরাধিকারসূত্রে মা-শোয়েই তাহার একমাত্র মহাজন। তাই এ কথায় সে সকলের চেয়ে বেশি লজ্জা পাইত। বলিল, তুমি বার বার এমন করিয়া খোঁটা দিলে আর আমি তোমার কাছে আসিব না।

বা-থিন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু ঋণের দায়ে পিতার মুক্তি

হইবে না, এত বড় বিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন শিহরিয়া উঠিল।

বা-থিনের পরিশ্রম আজ-কাল অত্যন্ত বাড়িয়াছে। প্রাতঃ হইতে একখানা নূতন ছবি আঁকিতেছিল, আজ সারাদিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই।

মা-শোয়ে প্রত্যহ যেমন আসিত, আজিও তেমনি আসিয়াছিল। বা-থিনের শোবার ঘর, বসিবার ঘর, ছবি আঁকিবার ঘর সমস্ত নিজের হাতে সাজাইয়া গুছাইয়া যাইত। চাকর-দাসীর উপর এ কাজটির ভার দিতে তাহার কিছুতেই সাহস হইত না।

সম্মুখে একখানা দর্পণ ছিল, তাহারই উপর বা-থিনের ছায়া পড়িয়াছিল। মা-শোয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বা-থিন, তুমি আমাদের মত মেয়েমানুষ হইলে এত দিন দেশের রাণী হইতে পারিতে।

বা-থিন মুখ তুলিয়া হাসিমুখে বলিল, কেন বল ত?

রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তাঁহার অনেক রাণী, কিন্তু এমন রঙ, এমন চুল, এমন মুখ কি তাঁহাদের কাহারও আছে? এই বলিয়া সে কাজে মন দিল, কিন্তু বা-থিনের

মনে পড়িতে লাগিল, মান্দালেতে সে যখন ছবি আঁকা শিখিতেছিল, তখনও এম্‌নি কথা তাহাকে মাঝে মাঝে শুনিতে হইত।

তখন সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু রূপ চুরি করার উপায় থাকিলে তুমি বোধ হয় আমাকে ফাঁকি দিয়া এত দিনে রাজার বামে গিয়া বসিতে।

মা-শোয়ে এই অভিযোগের কোন উত্তর দিল না, কেবল মনে মনে বলিল, তুমি নারীর মত দুর্ব্বল, নারীর মত কোমল, তাহাদের মতই সুন্দর—তোমার রূপের সীমা নাই।

এই রূপের কাছে সে আপনাকে বড় ছোট মনে করিত।

৩

বসন্তের প্রারম্ভে এই ইমেদিন গ্রামে প্রতি বৎসর অত্যন্ত সমারোহের সহিত ঘোড়-দৌড় হইত। আজ সেই উপলক্ষে গ্রামান্তের মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মা-শোয়ে ধীরে ধীরে বা-থিনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে একমনে ছবি আঁকিতেছিল, তাই তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

মা-শোয়ে কহিল, আমি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ। বা-থিন চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এত সাজ-সজ্জা কিসের?

বাঃ, তোমার বুঝি মনে নাই, আজ আমাদের ঘোড়-দৌড়? যে জয়ী হইবে, সে ত আজ আমাকেই মালা দিবে!

কই, তা ত শুনি নাই, বলিয়া বা-থিন তাহার তুলিটা পুনরায় তুলিয়া লইতে যাইতেছিল, মা-শোয়ে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, না শুনিয়াছ নেই নেই। কিন্তু তুমি ওঠ—আর কত দেরি করিবে?

এই দুটিতে প্রায় সমবয়সী—হয় ত বা-থিন দুই-চারি মাসের বড় হইতেও পারে, কিন্তু শিশুকাল হইতে এমনি করিয়াই তাহারা এই উনিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছে! খেলা করিয়াছে, বিবাদ করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে—আর ভালবাসিয়াছে।

সম্মুখের প্রকাণ্ড মুকুরে দুটি মুখ ততক্ষণ দুটি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বা-থিন দেখাইয়া কহিল, ঐ দেখ—

মা-শোয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ঐ দুটির পানে অতৃপ্ত নয়নে চহিয়া রহিল। অকস্মাৎ আজ প্রথম তাহার মনে হইল, সেও বড় সুন্দর। আবেশে দুই চক্ষু তাহার মুদিয়া আসিল, কানে কানে বলিল,

আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক। বা-খিন আরও কাছে তাহার মুখখানি টানিয়া আনিয়া বলিল, না, তুমি চাঁদের কলঙ্ক নও—তুমি কারও কলঙ্ক নও—তুমি চাঁদের কৌমুদীটি। একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।

কিন্তু নয়ন মেলিতে মা-শোয়ের সাহস হইল না, সে তেম্‌নি দুচক্ষু মুদিয়া রহিল।

হয় ত এমনি করিয়াই বহুক্ষণ কাটিত, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড নর-নারীর দল নাচিয়া গাহিয়া সুমুখের পথ দিয়া উৎসবে যোগ দিতে চলিয়াছিল। মা-শোয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, সময় হইয়াছে।

কিন্তু আমার যাওয়া যে একেবারে অসম্ভব মা-শোয়ে।

কেন?

এই ছবিখানি পাঁচ দিনে শেষ করিয়া দিব চুক্তি করিয়াছি।

না দিলে?

সে মান্দালে চলিয়া যাইবে, সুতরাং ছবিও লইবে না, টাকাও দিবে না।

টাকার উল্লেখে মা-শোয়ে কষ্ট পাইত, লজ্জাবোধ করিত। রাগ করিয়া বলিল, কিন্তু তা বলিয়া ত তোমাকে এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে দিতে পারি না।

বা-থিন এ কথার কোন উত্তর দিল না। পিতৃঋণ স্মরণ করিয়া তাহার মুখের উপর যে ম্লান ছায়া পড়িল, তাহা আর একজনের দৃষ্টি এড়াইল না।

কহিল, আমাকে বিক্রী করিও, আমি দ্বিগুণ দাম দিব।

বা-থিনের তাহাতে সন্দেহ ছিল না, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু করিব কি?

মা-শোয়ে গলার বহুমূল্য হার দেখাইয়া বলিল, ইহাতে যতগুলি মুক্তা, যতগুলি চুণি আছে, সবগুলি দিয়া ছবিটিকে বাঁধাইব, তার পরে শোবার ঘরে আমার চোখের উপর টাঙাইয়া রাখিব।

তার পরে?

তার পরে যেদিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার জ্যোৎস্নার আলো তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে—

তার পরে?

তার পরে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। নিচে মা-শোয়ের গরুর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার গাড়োয়ানের উচ্চকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল।

বা-থিন ব্যস্ত হইয়া কহিল, তার পরের কথা পরে শুনিব কিন্তু আর নয়। তোমার সময় হইয়া গিয়াছে—শিঘ্র যাও।

কিন্তু সময় বহিয়া যাইবার কোন লক্ষণ মা-শোয়ের আচরণে দেখা গেল না। কারণ সে আরও ভাল করিয়া বসিয়া কহিল, আমার শরীর খারাপ বোধ হইতেছে, আমি যাইব না।

যাইবে না? কথা দিয়াছ, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, তা জানো?

মা-শোয়ে প্রবল-বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, তা করুক। চুক্তি-ভঙ্গের অত লজ্জা আমার নাই—আমি যাইব না!

ছিঃ—

তবে তুমিও চল?

পারিলে নিশ্চয় যাইতাম, কিন্তু তাই বলিয়া আমার জন্য তোমাকে আমি সত্য ভঙ্গ করিতে দিব না। আর দেরি করিও না, যাও।

তাহার গম্ভীর মুখ ও শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া মা-শোয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিমানে মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল, তুমি নিজের সুবিধার জন্য আমাকে দূর করিতে চাও। দূর আমি হইতেছি, কিন্তু আর কখনও তোমার কাছে আসিব না।

এক মুহূর্ত্তে বা-থিনের কর্ত্তব্যের দৃঢ়তা স্নেহের জলে গলিয়া গেল, সে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, এত বড় প্রতিজ্ঞাটা করিয়া বসিও না মা-শোয়ে—আমি জানি, ইহার শেষ কি হইবে। কিন্তু আর ত বিলম্ব করা চলে না।

মা-শোয়ে তেমনি বিষণ্ণ-মুখেই উত্তর দিল, আমি না আসিলে খাওয়া-পরা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে তোমার যে দশা হইবে, সে আমি সহিতে পারিব না জানো বলিয়াই আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিলে। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৪

প্রায় অপরাহ্ণ-বেলায় মা-শোয়ের রূপা-বাঁধানো ময়ূর-পঙ্খী গো-যান যখন ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সমবেত জনমণ্ডলী প্রচণ্ড কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল।

সে যুবতী, সে সুন্দরী, সে অবিবাহিতা, এবং বিপুল ধনের অধিকারিণী। মানবের যৌবন-রাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। তাই এখানেও বহুমানের আসনটি তাহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সে আজ পুষ্পমাল্য বিতরণ করিবে। তাহার পর যে ভাগ্যবান এই রমণীর শিরে জয়মাল্যটি সর্ব্বাগ্রে পরাইয়া দিতে পারিবে, তাহার অদৃষ্টই আজ যেন জগতে হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু।

সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে রক্তবর্ণ পোষাকে সওয়ারগণ উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের আবেগ কষ্টে সংযত করিয়াছিল। দেখিলে মনে হয়, আজ সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছু নাই।

ক্রমশঃ সময় অসময় হইয়া আসিল এবং যে কয়জন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে আজ উদ্যত, তাহারা সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং

ক্ষণেক পরেই ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে মরি-বাঁচি-জ্ঞানশূন্য হইয়া এই কয় জন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ইহা বীরত্ব, ইহা যুদ্ধের অংশ। মা-শোয়ের পিতৃপিতামহগণ সকলেই যুদ্ধব্যবসায়ী, ইহার উন্মত্ত বেগ নারী হইলেও তাহার ধমনীতে বহমান ছিল। যে জয়ী হইবে, তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া সংবর্দ্ধনা না করিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

তাই যখন ভিন্ন-গ্রামবাসী এক অপরিচিত যুবক আরক্ত-দেহে, কম্পিত-মুখে, ক্লেদ-সিক্ত হস্তে শিরে তাহার জয়মাল্য পরাইয়া দিল, তখন তাহার আগ্রহের আতিশয্য অনেক সম্ভ্রান্ত রমণীর চক্ষেই কটু বলিয়া ঠেকিল।

ফিরিবার পথে সে তাহাকে আপনার পার্শ্বে গাড়ীতে স্থান দিল এবং সজল-কণ্ঠে কহিল, আপনার জন্য আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম। একবার এমনও মনে হইয়াছিল, অত বড় উঁচু প্রাচীর কোনরূপে যদি কোথাও পা ঠেকিয়া যায়!

যুবক বিনয়ে ঘাড় হেঁট করিল, কিন্তু এই অসমসাহসী বলিষ্ঠ বীরের সহিত মা-শোয়ে মনে মনে তাহার সেই দুর্ব্বল, কোমল ও সর্ব্ববিষয়ে অপটু চিত্রকরের সহিত তুলনা না করিয়া পারিল না।

এই যুবকটির নাম পো-থিন। কথায় কথায় পরিচয় হইলে

জানা গেল, ইনিও উচ্চবংশীয়, ইনিও ধনী এবং তাহাদেরই দূর আত্মীয়।

মা-শোয়ে আজ অনেককেই তাহার প্রাসাদে সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহারা এবং আরও বহুলোক ভিড় করিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। আনন্দের আগ্রহে, তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্যোত্থিত ধূলার মেঘে ও সঙ্গীতের অসহ্য নিনাদে সন্ধ্যার আকাশ তখন একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

এই ভয়ঙ্কর জনতা যখন তাহার বাটীর সুমুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত বা-থিন তাহার কাজ ফেলিয়া জানালায় আসিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।

৫

সান্ধ্য-ভোজের প্রসঙ্গে পরদিন মা-শোয়ে বা-থিনকে কহিল, কাল সন্ধ্যাটা আনন্দে কাটিল। অনেকেই দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তোমার সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।

সেই ছবিটা সে প্রাণপণে শেষ করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, ভালই করিয়াছিলে। এই বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল।

বিস্ময়ে মা-শোয়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কথার ভারে তাহার পেট ফুলিতেছিল, কাল বা-থিন কাজের চাপে উৎসবে যোগ দিতে পারে নাই, তাই আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক গল্প করিবে মনে করিয়াই সে আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্তই উল্টা রকমের হইয়া গেল। কেবল একা একা প্রলাপ চলিতে পারে, কিন্তু আলাপের কাজ চলে না, তাই সে শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই অপর পক্ষের প্রবল ঔদাস্য ও গভীর নীরবতার রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আজ ভরসা করিল না। প্রতিদিন যে সকল ছোটখাটো কাজগুলি সে

করিয়া যায়, আজ সেগুলিও পড়িয়া রহিল—কিছুতেই হাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এইভা অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল—একবার বা-থিন মুখ তুলিল না, একবার একটা প্রশ্ন করিল না। কালকের অতবড় ব্যাপারের প্রতিও তাহার যেমন লেশমাত্র কৌতূহল নাই, কাজের ফাঁকে হাঁফ ফেলিবারও তাহার তেমন অবসর নাই।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে কুন্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া থাকিয়া অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, আজ আমি আসি।

বা-থিন ছবির উপর চোখ রাখিয়াই বলিল, এসো।

যাইবার সময় মা-শোয়ের মনে হইল, যেন সে এই লোকটির অন্তরের কথাটা বুঝিয়াছে। জিজ্ঞাসা করে, একবার স ইচ্ছাও হইল বটে কিন্তু মুখ খুলিতে পারিল না, নীরবেই বাহি হইয়া গেল।

বাটীতে পা দিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। গত রাত্রির আনন্দ-উৎসবের জন্য ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছিল। অতিথিকে মা-শোয়ে যত্ন করিয়া বসাইল।

লোকটা প্রথমে মা-শোয়ের ঐশ্বর্য্যের কথা তুলিল, পরে তাহার বংশের কথা, তাহার পিতার খ্যাতির কথা, তাহার রাজদ্বারে সম্ভ্রমের কথা এমনি কত কি যে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

এ সকল কতক বা সে শুনিল, কতক বা তাহার অন্যমনস্ক কানে পৌঁছিল না। কিন্তু লোকটা শুধু বলিষ্ঠ এবং অতি সাহসী ঘোড়সওয়ারই নয়, সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত। মা-শোয়ের এই ঔদাসীন্য তাহার অগোচর রহিল না। সে মান্দালের রাজ-পরিবারের প্রসঙ্গ তুলিয়া অবশেষে যখন সৌন্দর্য্যের আলোচনা সুরু করিল এবং কৃত্রিম সারল্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই রমণীকে লক্ষ্য এবং উপলক্ষ করিয়া বারম্বার তাহার রূপ ও যৌবনের ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে মনে অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা অপরূপ আনন্দ ও গৌরব অনুভব না করিয়াও থাকিতে পারিল না।

আলাপ শেষ হইলে পো-থিন যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন আজিকার রাত্রির জন্যও সে আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া গেল।

কিন্তু চলিয়া গেলে তাহার কথাগুলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মা-শোয়ের সমস্ত মন ছোট এবং গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার জন্য বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার অবধি রহিল না। সে তাড়াতাড়ি আরও জন-কয়েক বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চাকর দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। অতিথিরা যথাসময়েই হাজির হইলেন এবং আজও অনেক হাসি-তামাসা, অনেক গল্প, অনেক নৃত্য-গীতের

সঙ্গে যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ হইল, তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সে শুইতে গেল; কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। কিন্তু বিস্ময় এই যে, যাহা লইয়া তাহার এতক্ষণ এমন করিয়া কাটিল, তাহার একটা কথাও আর মনে আসিল না। সে সকল যেন কত যুগের পুরানো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—এমনি শুষ্ক, এমনি বিরস। তাহার কেবলি মনে পড়িতে লাগিল আর একটা লোককে, যে তাহারই উদ্যান প্রান্তের একটা নির্জ্জন গৃহে এখন নির্ব্বিঘ্নে আছে—আজিকার এত বড় মাতা-মাতির লেশমাত্রও তাহার কানে যাইবার হয় ত এতটুকু পথও কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই।

৬

চিরদিনের অভ্যাস, প্রভাত হইতেই মা-শোয়েকে টানিতে লাগিল। আবার সে গিয়া বা-থিনের ঘরে আসিয়া বসিল।

প্রতিদিনের মত আজিও সে কেবল একটা এসো বলিয়াই তাহার সহজ অভ্যর্থনা শেষ করিয়া কাজে মন দিল, কিন্তু কাছে বসিয়াও আর একজনের আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, ওই কর্ম্মনিরত নীরব লোকটি নীরবেই যেন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মা-শোয়ে কথা খুঁজিয়া পাইল না। তার পরে সঙ্কোচ কাটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর বাকি কত?

অনেক।

তবে এই দুদিন ধরিয়া কি করিলে?

বা-থিন ইহার জবাব না দিয়া চুরুটের বাক্সটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এই মদের গন্ধটা আমি সইতে পারি না।

মা-শোয়ে এই ইঙ্গিত বুঝিল। জ্বলিয়া উঠিয়া হাত দিয়া বাক্সটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আমি সকাল-বেলা চুরুট খাই না— চুরুট দিয়া গন্ধ ঢাকিবার কাজও করি নাই—আমি ছোটলোকের মেয়ে নই।

বা-থিন মুখ তুলিয়া শান্ত-কণ্ঠে কহিল, হয় ত তোমার জামা-কাপড়ে কোনরূপে লাগিয়াছে মদের গন্ধটা আমি বানাইয়া বলি নাই।

মা-শোয়ে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—তুমি যেমন নিচ, তেমনি হিংসুক, তাই আমাকে বিনা দোষে অপমান করিলে। আচ্ছা, তাই ভাল, আমার জামা-কাপড় তোমার ঘর হইতে আমি চিরকালের জন্য সরাইয়া লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল, বা-থিন পিছনে ডাকিয়া তেমনি সংযতস্বরে বলিল, আমাকে নিচ ও হিংসুক কেহ কথনও বলে নাই, তুমি হঠাৎ অধঃপথে যাইতে উদ্যত হইয়াছ বলিয়াই সাবধান করিয়াছি।

মা-শোয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অধঃপথে কি করিয়া গেলাম?

তাই আমার মনে হয়।

আচ্ছা, এই মন লইয়াই থাকো; কিন্তু যাহার পিতা আশীর্বাদ রাখিয়া গিয়াছেন, সন্তানের জন্য অভিশাপ রাখিয়া যান নাই, তাহার সঙ্গে তোমার মনের মিল হইবে না।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু বা-থিন স্থির হইয়া বসিয়া

রহিল। কেহ যে-কোন কারণেই তাহাকে এমন মর্ম্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে পারে, এত ভালোবাসা একদিনেই সে এত বড় বিষ হইয়া উঠিতে পারে, ইহা যে ভাবিতেও পরিত না।

মা-শোয়ে বাটী আসিয়াই দেখিল পো-থিন বসিয়া আছে। সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মধুর করিয়া একটু হাস্য করিল।

হাসি দেখিয়া মা-শোয়ের দুই ভ্রূ বোধ করি অজ্ঞাতসারেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিল, আপনার কি বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?

না, প্রয়োজন এমন—

তা হ'লে আমার সময় হবে না, বলিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া মা-শোয়ে উপরে চলিয়া গেল।

গত নিশার কথা স্মরণ করিয়া লোকটা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু বেহারাটা সুমুখে আসিতেই কাষ্ঠহাসির সঙ্গে হাতে তাহার একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া শিষ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

৭

শিশুকাল হইতে যে দুই জনের কখনও এক মুহূর্তের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে নাই, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মাসাধিক কাল গত হইয়াছে, কাহারও সহিত কেহ সাক্ষাৎ করে নাই।

মা-শোয়ে এই বলিয়া আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ একপ্রকার ভালোই হইল যে, যে মোহের জাল এই দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাকে কঠিন বন্ধনে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার সহিত বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এই ধনীর কন্যার উদ্দাম প্রকৃতি পিতা বিদ্যমানেও অনেক দিন এমন অনেক কাজ করিতে চাহিয়াছে, যাহা কেবল মাত্র গম্ভীর ও সংযতচিত্ত বা-থিনের বিরক্তির ভয়েই পারে নাই। কিন্তু আজ সে স্বাধীন—একেবারে নিজের মালিক নিজে। কোথাও কাহারো কাছে আর লেশমাত্র জবাবদিহি করিবার নাই। এই একটিমাত্র কথা লইয়া সে মনে মনে অনেক তোলা-পাড়া, অনেক ভাঙা-গড়া করিয়াছে, কিন্তু একটা দিনের জন্যও কখনো আপনার হৃদয়ের নিগূঢ়তম গৃহটির দ্বার খুলিয়া দেখে নাই,

সেখানে কি আছে !' দেখিলে দেখিতে পাইত, এত দিন শুদ্ধমাত্র সে আপনাকেই আপনি ঠকাইয়াছে। সেই নিভৃত গোপন কক্ষে দিবানিশি উভয়ে মুখোমুখী বসিয়া আছে—প্রেমালাপ করিতেছে না, কলহ করিতেছে না—কেবল নিঃশব্দে উভয়ের চক্ষু বাহিয়া অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

নিজেদের জীবনের এই একান্ত করুণ চিত্রটি তাহার মনশ্চক্ষের অগোচর ছিল বলিয়াই ইতিমধ্যে গৃহে তাহার অনেক উৎসব-রজনীর নিষ্ফল অভিনয় হইয়া গেল—পরাজয়ের লজ্জা তাহাকে ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া দিল না।

কিন্তু আজিকার দিনটা ঠিক তেমন করিয়া কাটিতে ছিল না। কেন, সেই কথাটাই বলিব।

জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর তাহার গৃহে একটা আমোদ-আহ্লাদ ও খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান হইত। আজ সেই আয়োজনটাই কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বরের সহিত হইতেছিল। বাটীর দাস-দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত আসিয়া যোগ দিয়াছে। কেবল তাহার নিজেরই যেন কিছুতে গা নাই। সকাল হইতে আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বৃথা, সমস্ত পণ্ডশ্রম। কেমন করিয়া যেন এত দিন তাহার

মনে হইতেছিল, ওই লোকটাও দুনিয়ার অপর সকলেরই মত, সেও মানুষ—সেও ঈর্ষ্যার অতীত নয়। তাহার গৃহের এই যে সব আনন্দ-উৎসবের অপর্য্যাপ্ত ও নব নব আয়োজন, ইহার বার্ত্তা কি তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ভেদিয়া সেই নিভৃত কক্ষে গিয়া পশে না? তাহার কাজের মধ্যে কি বাধা দেয় না?

হয় ত বা সে তাহার তুলিটা ফেলিয়া দিয়া কখনও স্থির হইয়া বসে, কখনও বা অস্থির দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা নিদ্রাবিহীন তপ্তশয্যায় পড়িয়া সারারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, কখনও বা—কিন্তু থাক্ সে সব।

কল্পনায় এতদিন মা-শোয়ে একপ্রকার তীক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব করিতেছিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ মনে হইতেছিল কিছুই না—কিছুই না। তাহার কোন কাজেই তাহার কোন বিঘ্ন ঘটায় না। সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ফাঁকি। সে ধরিতেও চাহে না—ধরা দিতেও চাহে না। ওই কেমন দুর্ব্বল দেহটা অকস্মাৎ কি করিয়া যেন একেবারে পাহাড়ের মত কঠিন ও অচল হইয়া গিয়াছে—কোথাকার কোন ঝঞ্চাই আর তাহাকে একবিন্দু বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু তথাপি জন্মতিথি উৎসবের বিরাট আয়োজন

আড়ম্বরের সঙ্গেই চলিতেছিল। পো-থিন আজ সর্ব্বত্র, সকল কাজে। এমন কি, পরিচিতদের মধ্যে একটা কাণা-ঘুষাও চলিতেছিল যে, এক দিন এই লোকটাই এ বাড়ির কর্ত্তা হইয়া উঠিবে—এবং বোধ হয়, সে দিন বড় বেশি দূরেও নয়।

গ্রামের নরনারীতে বাড়ি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে—চারিদিকেই আনন্দ কলরব। শুধু যাহার জন্য এই সব, সেই মানুষটিই বিমনা—তাহারই মুখ নিরানন্দের ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এই ছায়া বাহিরের কাহারো প্রায় চোখে পড়িল না—পড়িল কেবল বাটীর দুই-এক জন সাবেক দিনের দাস-দাসীর। আর পড়িল বোধ হয় তাঁহার—যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়াও সমস্ত দেখেন। কেবল তিনিই দেখিতে লাগিলেন, ওই মেয়েটির কাছে আজ সমস্তই শুধু বিড়ম্বনা। এই জন্মতিথির দিনে প্রতিবৎসর যে লোকটি সকলের আগে গোপনে তাহার গলায় আশীর্ব্বাদের মালা পরাইয়া দিত, আজ সে লোক নাই, সে মালা নাই, সে আশীর্ব্বাদের আজ একান্ত অভাব।

মা-শোয়ের পিতার আমলের বৃদ্ধ আসিয়া কহিল, ছোটমা, কই তাহাকে ত দেখি না?

বুড়া কিছুকাল পূর্ব্বে কর্ম্মে অবসর লইয়া চলিয়া গিয়াছিল,

তাহার ঘরও অন্য গ্রামে—এই মনান্তরের খবর সে জানিত না। আজ আসিয়া চাকর-মহলে শুনিয়াছে। মা-পোয়ে উদ্ধতভাবে বলিল, দেখিবার দরকার থাকে, তাহার বাড়ি ও— আমার এখানে কেন?

বেশ, তাই যাইতেছি, বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। মনে মনে বলিয়া গেল, কেবল তাঁহাকে একাকী দেখিলেই ত চলিবে না—তোমাদের দুইজনকেই আমার একসঙ্গে দেখা চাই। নইলে এতটা পথ বৃথাই হাঁটিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু বুড়ার মনের কথাটি এই নবীনার অগোচর রহিল না। সেই অবধি এক প্রকার সচকিত অবস্থাতেই তাহার সকল কাজের মধ্যে সময় কাটিতেছিল, সহসা একটা চাপা গলার অস্ফুট শ চাহিয়া দেখিল—বা-থিন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া ; কিন্তু চক্ষের নিমেষে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

খানিক পরে বুড়া আসিয়া কহিল, ছোটমা, যাহাই হোক, তোমার অতিথি! একটা কথাও কি কহিতে নাই?

কিন্তু তোমাকে ত আমি ডাকিয়া আনিতে বলি নাই?

সেইটাই আমার অপরাধ হইয়া গিয়াছে, বলিয়া সে

চলিয়া যাইতেছিল, মা-শোয়ে ডাকিয়া কহিল, বেশ ত, আমি ছাড়া আরও ত লোক আছে, তাঁহারা ত কথা বলিতে পারেন!

বুড়া বলিল, তা পারেন, কিন্তু তার আবশ্যক নাই, তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

মা-শোয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পরে কহিল, আমার কপাল। নইলে তুমিও ত তাঁহাকে খাইয়া যাইবার কথাটা বলিতে পারিতে!

না, আমি এত নির্লজ্জ নই, বলিয়া বুড়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল!

৮

এই অপমানে বা-থিনের চোখে জল আসিল। কিন্তু সে কাহাকেও দোষ দিল না, কেবল আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া কহিল, এ ঠিকই হইয়াছে। আমার মত লজ্জাহীনের ইহারই প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু প্রয়োজন যে ঐখানেই—ঐ একটা রাত্রির ভিতর দিয়াই শেষ হয় নাই, ইহার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি অপমান যে তাহার অদৃষ্টে ছিল, ইহা দিন-দুই পরে টের পাইল; আর এমন করিয়া টের পাইল যে, সে লজ্জা সারাজীবনে কোথায় রাখিবে, তাহার কূল-কিনারা দেখিল না।

যে ছবিটার কথা লইয়া এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে, জাতকের সেই গোপার চিত্রটা এত দিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে, একমাসের অধিক কাল অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফল আজ শেষ হইয়াছে। সমস্ত সকালটা সে এই আনন্দেই মগ্ন হইয়া রহিল।

ছবি রাজদরবারে যাইবে, যিনি দাম দিয়া লইয়া যাইবেন, সংবাদ পাইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ছবির আবরণ

উন্মুক্ত হইলে তিনি চমকিয়া গেলেন। চিত্র সম্বন্ধে তিনি আনাড়ী ছিলেন না; অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ক্ষুব্ধ-স্বরে বলিলেন, এ ছবি আমি রাজাকে দিতে পারিব না।

বা-থিন ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, কেন?

তার কারণ এ মুখ আমি চিনি। মানুষের চেহারা দিয়া দেবতা গড়িলে দেবতাকে অপমান করা হয়। এ কথা ধরা পড়িলে রাজা আমার মুখ দেখিবেন না। এই বলিয়া সে চিত্রকরের বিস্ফারিত ব্যাকুল চক্ষের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন—এ কে। এ ছবি চলিবে না!

বা-থিনের চোখের উপর হইতে ধীরে ধীরে একটা কুয়াসার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। ভদ্রলোক চলিয়া গেলেও সে তেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর তাহার বুঝিতে বাকি নাই, এতদিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে সৌন্দর্য্য যে মাধুর্য্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে অহর্নিশি ছলনা করিয়াছে—সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহারই মা-শোয়ে।

চোখ মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান। আমাকে এমন করিয়া বিড়ম্বিত করিলে—তোমার আমি কি করিয়াছিলাম!

৯

পো-থিন সাহস পাইয়া বলিল, তোমাকে দেবতাও কামনা করেন, মা-শোয়ে, আমি ত মানুষ।

মা-শোয়ে অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, কিন্তু যে [illegible] না, সে বোধ হয় তবে দেবতারও বড়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গকে সে আর অগ্রসর হইতে দিল না, কহিল, শুনিয়াছি, দরবারে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে—আমার একটা কাজ করিয়ে দিতে পারেন? খুব শিগ্র?

পো-থিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

এক জনের কাছে আমি অনেক টাকা পাই, কিন্তু আদায় করিতে পারি না। কোন দলীল নাই! আপনি কিছু উপায় করিতে পারেন?

পারি। কিন্তু তুমি কি জানো না, এই রাজকর্ম্মচারীটি কে? বলিয়া লোকটা হাসিল।

এই হাসির মধ্যেই স্পষ্ট উত্তর ছিল। মা-শোয়ে ব্যগ্র হইয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে দিন একটি উপায় করিয়া। আজই। আমি একটা দিনও আর বিলম্ব করিতে চাই না।

পো-থিন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ, তাই।

এই ঋণটা চিরদিন এত তুচ্ছ, এত অসম্ভব, এতই হাসির কথা ছিল যে, এ সম্বন্ধে কেহ কখনো চিন্তা পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীর মুখের আশায় মা-শোয়ের সমস্ত দেহ এক মুহূর্তের উত্তেজনায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; সে দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিতে লাগিল, আমি কিছুই ছাড়িয়া দিব না—একটা কড়ি পর্য্যন্ত না। জোঁক যেমন করিয়া রক্ত শুষিয়া লয়, ঠিক তেম্‌নি করিয়া। আজই—এখনই হয় না?

এ বিষয়ে এই লোকটাকে অধিক বলা বাহুল্য। ইহা তাহার আশার অতীত! সে ভিতরের আনন্দ ও আগ্রহ কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, রাজার আইন অন্ততঃ সাত দিনের সময় চায়। এ সময়টুকু কোনরূপে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে।

তাহার পরে যেমন করিয়া খুসী, যত খুসী রক্ত শুষিবেন, আমি আপত্তি করিব না।

সেই ভাল। কিন্তু এখন আপনি যান। এই বলিয়া সে একপ্রকার যেন ছুটিয়া পলাইল।

এই দুর্ব্বোধ মেয়েটির প্রতি লোকটির লোভের অবধি ছিল না। তাই অনেক অবহেলা সে নিঃশব্দে পরিপাক করিত, আজিও করিল। বরঞ্চ গৃহে ফিরিবার পথে আজ তাহার পুলকিত চিত্ত পুনঃ পুনঃ এই কথাটাই আপনাকে আপনি কহিতে লাগিল আর ভয় নাই—তাহার সফলতার পথ নিষ্কণ্টক হইতে আর বোধ হয় অধিক বিলম্ব হইবে না। বিলম্ব হইবে না, সে কথা সত্য। কিন্তু কত শিঘ্র এবং কত বড় বিস্ময় যে ভগবান তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এ আজ কল্পনা করাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না

ঋণের দাবির চিঠি আসিল। কাগজখানা হাতে করিয়া বা-থিন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এই জিনিসটি সে আশা করে নাই বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যও হইল না। সময় অল্প, শিগ্র কিছু একটা করা চাই।

এক দিন নাকি মা-শোয়ে রাগের উপর তাহার পিতার অপব্যয়ের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহার এ অপরাধ সে বিস্মৃতও হয় নাই, ক্ষমাও করে নাই। তাই সে সময়ভিক্ষার নাম করিয়া আর তাঁহাকে অপমান করিবার কল্পনাও করিল না। শুধু চিন্তা এই যে, তাহার যাহা কিছু আছে, সব দিয়াও পিতাকে ঋণমুক্ত করা যাইবে কি না। গ্রামের মধ্যেই এক জন ধনী মহাজন ছিল। পরদিন সকালেই সে তাহার কাছে গিয়া গোপনে সর্ব্বস্ব বিক্রী করিবার প্রস্তাব করিল। দেখা গেল, যাহা তিনি দিতে চাহেন, তাহাই যথেষ্ট। টাকাটা সে সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিল, কিন্তু একজনের অকারণ হৃদয়হীনতা যে তাহার সমস্ত দেহ-মনের উপর অজ্ঞাতসারে কত বড় আঘাত দিয়াছিল, ইহা সে জানিল তখন, যখন জ্বরে পড়িল।

কোথা দিয়া যে দিন-রাত্রি কাটিল, তাহার খেয়াল রহিল না। জ্ঞান হইলে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই দিনই তাহার মেয়াদের শেষদিন।

আজ শেষ-দিন। আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া মা-শোয়ে কল্পনার জাল বুনিতেছিল। তাহার নিজের অহঙ্কার অনুক্ষণ ঘা খাইয়া খাইয়া আর একজনের অহঙ্কারকে একেবারে অভ্রভেদী উচ্চ করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। সেই বিরাট্ অহঙ্কার আজ তাহার পদমূলে পড়িয়া যে মাটীর সঙ্গে মিশাইবে, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, নিচে বা-থিন অপেক্ষা করিতেছে। মা-শোয়ে মনে মনে ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, জানি। সে নিজেও ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মা-শোয়ে নিচে আসিতেই বা-থিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মা-শোয়ের বুকে শেল বিঁধিল। টাকা সে চাহে না, টাকার প্রতি লোভ তাহার কাণাকড়ির নাই, কিন্তু সেই টাকার নাম দিয়া কত ভয়ঙ্কর অত্যাচার যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা সে আজ এই দেখিল। বা-থিন

প্রথমে কথা কহিল, বলিল, আজ সাত দিনের শেষ দিন, তোমার টাকা আনিয়াছি।

হায় রে, মানুষ মরিতে বসিয়াও দর্প ছাড়িতে চায় না। নইলে প্রত্যুত্তরে এমন কথা মা-শোয়ের মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইতে পারিল যে, সে সামান্য কিছু টাকা প্রার্থনা করে নাই—ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে বলিয়াছে।

বা-থিনের পীড়িত, শুষ্ক-মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, বলিল, তাই বটে, তোমার সমস্ত টাকাই আনিয়াছি।

সমস্ত টাকা? পাইলে কোথায়?

কালই জানিতে পারিবে। ওই বাক্সটায় টাকা আছে, কাহাকেও গণিয়া লইতে বল।

গাড়োয়ান দ্বারপ্রান্ত হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত বিলম্ব হইবে? বেলা থাকিতে বাহির হইতে না পারিলে যে পেগুতে রাত্রের মত আশ্রয় মিলিবে না!

মা-শোয়ে গলা বাড়াইয়া দেখিল, পথের উপর বাক্স বিছানা প্রভৃতি বোঝাই দেওয়া গো-যান দাঁড়াইয়া। ভয়ে চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যাকুল হইয়া একেবারে

সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল, পেগুতে কে যাইবে? গাড়ী কার? কোথায় এত টাকা পাইলে? চুপ করিয়া আছ কেন? তোমার চোখ অত শুক্‌নো কিসের জন্য? কাল কি জানিব? আজ বলিতে তোমার—

বলিতে বলিতেই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল—এবং নিমেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিল—উঃ—এ যে জ্বর, তাই ত বলি, মুখ অত ফ্যাকাসে কেন?

বা-থিন আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শান্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, ব'স। বলিয়া সে নিজেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি মান্দালে যাত্রা করিয়াছি। আজ তুমি আমার একটা শেষ অনুরোধ শুনিবে?

মা-শোয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিবে। বা-থিন একটু স্থির থাকিয়া কহিল, আমার শেষ অনুরোধ, সৎ দেখিয়া কাহাকেও শিগ্র বিবাহ করিও। এমন অবিবাহিত অবস্থায় আর বেশি দিন থাকিও না। আর একটা কথা—

এই বলিয়া সে আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া এবার আরও মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আর একটা জিনিষ তোমাকে চিরকাল

মনে রাখিতে বলি। এই কথাটা কখনও ভুলিবে না যে, লজ্জার মত অভিমানও স্ত্রীলোকের ভূষণ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে—

মা-শোয়ে অধীর হইয়া মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ও-সব আর একদিন শুনিব। টাকা পাইলে কোথায়?

বা-থিন হাসিল। কহিল, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার কি না তুমি জানো?

টাকা পাইলে কোথায়?

বা-থিন ঢোক গিলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিল, বাবার ঋণ তাঁর সম্পত্তি দিয়াই শোধ হইয়াছে—নইলে আমার নিজের আর আছে কি?

তোমার ফুলের বাগান?

সে-ও ত বাবার।

তোমার অত বই?

বই লইয়া আর করিব কি? তা ছাড়া সে-ও ত তাঁরই।

মা-শোয়ে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক্ ভালই হইয়াছে। এখন উপরে গিয়া শুইয়া পড়িবে চল।

কিন্তু আজ যে আমাকে যাইতেই হইবে।

এই জ্বর লইয়া? এ কি তুমি সত্যই বিশ্বাস কর, তোমাকে

আমি এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিব? এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া আবার তাহার হাত ধরিল। এবার বা-থিন বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, মা-শোয়ের মুখের চেহারা এক মুহূর্তেই একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে মুখে বিষাদ, বিদ্বেষ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই। আছে শুধু বিরাট স্নেহ ও তেমনি বিপুল শঙ্কা। এই মুখ তাহাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল, সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার পিছনে পিছনে উপরে শয়ন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া মা-শোয়ে কাছে বসিয়া, দুটি সজল দৃপ্ত চক্ষু তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, তুমি কি মনে কর, কতকগুলো টাকা আনিয়াছ বলিয়াই আমার ঋণ শোধ হইয়া গেল? মান্দালের কথা ছাড়িয়া দাও, আমার হুকুম ছাড়া এই ঘরের বাহিরে গেলেও আমি ছাদ হইতে নিচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ, কিন্তু আর দুঃখ কিছুতে সহিব না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয়ই বলিয়া দিলাম!

বা-থিন আর জবাব দিল না। গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিলাসী*

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ-বারো জন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়—চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়,

---

* অনেক পল্লীবালকের ডায়েরী হইতে নকল। তার আসল নামটা কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই নিষেধও আছে। ডাকনামটা না হয় ধরুন ন্যাড়া।

সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুসী হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তার পরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া এক দিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান—তাঁদের চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকেই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দ্দশা হয় না!

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক্, কিন্তু ঐ চার-ক্রোশ-হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পালান, তাহার আর সংখ্যা নাই। তার পরে এক দিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু সহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক্ এ সকল বাজে কথা। ইস্কুলে যাই—

ছক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত ছ-তিন খানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে স্থরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁইচি ফল অপর্য্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁটাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্ত্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুর-মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামস্কট্‌কার রাজধানীর নাম কি, এবং সাইবিরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে না সোনা মেলে—এ সকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসৎই মেলে না।

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্‌লক খাঁ—এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে—তার পরে প্রোমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি মাষ্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

ছবি

আমাদের গ্রামে একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাশে পড়িত। কবে যে সে প্রথম থার্ড ক্লাশে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না— সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না; ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁটালের বাগান আর তার মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ি; আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এম্নি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্দ্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল এক দিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া থাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের থাওয়া-পরা চলিত; এবং ভাল করিয়াই চলিত। যে দিন দেখা হইয়াছে, সেই দিনই দেখিয়াছি মৃত্যুঞ্জয় ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কথনো কাহারো সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের থাবার কিনিয়া থাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে, ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ কথাও কোন বাপ ভদ্র-সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত দেখা নাই। এক দিন শোনা গেল সে মর মর। আর একদিন শোনা গেল, মাল-পাড়ার

এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেক দিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, এক দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়ো-বাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তাপোষের উপর পরিষ্কার ধপ্‌ধপে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায় বাস্তবিকই যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক্, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়া ভিজাইয়া-

রাখা বাসি ফুলের মত।' হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে!

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ব'সো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল এই কয়েক দিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে, এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার! দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য্য, কত রাত-জাগা! সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিয়াছিল,

তাহার পরিচয় যদিচ সে দিন পাই নাই, কিন্তু আর এক দিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আবার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্য্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্য্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট্ অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা না বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, বন-জঙ্গলের পথ, একটু দেখে দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল! হয় ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্য্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃত-কল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন! মৃত্যুঞ্জ ত যে কোন মুহূর্ত্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত! কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত!

এই প্রসঙ্গের অনেক দিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি—বাটীতে ছেলে-পুলে চাকর-বাকর নাই,

ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য-বিধবা-স্ত্রী, আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপা-দাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে আর তিলার্দ্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? এমনি কত কি! কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেওয়া চাই—অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই, যা হবার সে ত হয়েছে, আর বাইরে গিয়ে কি হবে? রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক্ কাজ, তুমি ব'সো।

বলিলাম, বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হবে, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ্ রে! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহে, তাঁর মৃত দেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না!

বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও, আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্ত্তব্য-জ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোন মেয়ে-মানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি,

যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর-করার পরেও হয় ত তাহার কোন সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয় যখন কোন নর-নারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় ত হোক্, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া কোনমতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয় ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে অত-বড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই? তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয় এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামের ছিল কি না, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই তখন সে যে বাঁচিয়া আছে, এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ এক দিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে যে গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না—অকাল-কুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক্, তাহার হাতে ভাত পর্য্যন্ত খাইতেছে! গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়! কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ এ কথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা! অ্যাঁ—এ হইল কি? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাসা দেখিতে-ছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে! নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায়

না! এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে!

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারো জন সঙ্গে চলিলাম, গ্রামের বদন্ দগ্ধ না হয় এই জন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দার একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠিসোঁটা হাতে এত-গুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট্ করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া, সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ সুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোন খুড়া কোন কালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এম্নি, যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না;

চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েচে জানো।

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারো জন বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো—এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে অত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্ত্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ-দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্ব্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না! আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নর-নারী, যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া-

ছিল, তার পরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, বাবুরা আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা-মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্দ্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেন না আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্ব্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভাল কাজ করিতেছি, সেও কিছুতে মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা যাক্।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক্ হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিত, তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না! আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা—এ ত একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া! হোক না সে আড়াই মাসের রুগী, হোক্ না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়! ভাত খাওয়া যে, অন্ন-পাপ! সে ত আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না! তা নইলে পল্লীগ্রামের লোক সঙ্কীর্ণচিত্ত নয়। চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যা যে সব ছেলের পেটে, তারাই ত এক দিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়! দেবী বীণাপাণির বরে সঙ্কীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!

এই ত ইহারই কিছু দিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই

কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে অর্দ্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে! যাই হোক্, ছোটবাবু তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যে, গ্রামের বারওয়ারী-পূজা-বাবত দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর প্রত্যেক সদ্ব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাশ দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি, পথে আসিতে অনেকেই, দেশের এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত, কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক, তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সব সদনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক্। মহত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেক দিন ঘুরিয়া, গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্ম্মেই বল, সমাজেই বল,

আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারে পুরা হইয়া আছে ; এখন শুধু ইংরাজকে কসিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। এক দিন দুপুর-বেলা ক্রোশ-দুই দূরের মাল পাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথায় গেরুয়া-রঙের পাগড়ী, বড় বড় দাড়ি, চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁথির মালা—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়! কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত শিঘ্র যে তাহার চৌদ্দ পুরুষের জাতটা বিসর্জ্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেতরাণী বিবাহ করিয়া মেতর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার

চরায়। ভাল কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল! কিন্তু সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই ত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না! যে পল্লীগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে! অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক্। ঝোঁকের মাথায় হয় ত বা অনধিকার চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুস্কিল হইয়াছে, এই যে আমি কোনমতেই ভুলিতে পারি না দেশের নব্বুই জন নর-নারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক্। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল।

বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুসি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, তুমি না আগ্‌লালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেল্‌ত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশঃ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে, এ কথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু আমাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম, আজ কোথায় না কি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলে-বেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপর আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখরো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক! আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস-খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ্ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ-ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কব্জিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে—

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—
মনসা দেবী আমার মা—
ওলট পালট পাতাল-ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
—দুধরাজ, মণিরাজ!
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে!

ইহার মানে যে কি, তাহা আমি জানি না। কারণ যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—নিশ্চয়ই কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে এক দিন এই মন্ত্রের সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা

হইয়া গেল বটে, কিন্তু যত দিন না হইল, তত দিন সাপ-ধরার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে! সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ্ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে, সে ত ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এ সব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়া-চাড়া ক'রো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলা এমনি অবহেলার সহিত করিতে সুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপ-ধরাও কঠিন নয়, এবং ধরা সাপ দুই-চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না!

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার-কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তার পরে তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক আর একটা কাঠিই দেখান হোক, সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে—এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুক্ গে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছি মিছি লোক ঠকাতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। সাপ-ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানা প্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত—আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এম্নি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে ত একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে

পারিত না। আর আমার ত এক রকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নানা প্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম্ না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথাও ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে এক দিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সে দিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়ি সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্ত্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে—সে হেঁট হইয়া কয়েক টুক্‌রা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক জোড়া ত আছে বটেই, হয় ত বা বেশিও থাক্‌তে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখচ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে?

বিলাসী কহিল, দুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বল্‌চি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, এবং মর্ম্মান্তিক ভাবেই সে দিন ফলিল। মিনিট-দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা সবাই যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত্ত হইতে এক হাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া, আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল, এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল, সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার ঊর্দ্ধে আর উঠিবে না। এবং, আমার সেই, "বিষ-হরির আজ্ঞে" মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন, সকলকে খবর দিবার জন্য

দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সংবাদ দিবার জন্ম লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পোনেরো-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া নাকে কথা কহিতে সুরু করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটীর উপরে একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, আমার বিষহরির দোহাই বুঝি-বা আর খাটে না।

নিকটবর্ত্তী আরও দুই-চারি জন ওস্তাদ্ আসিয়া পড়িলেন, এবং আমরা কখনো বা একসঙ্গে কখনো আলাদা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল, ভাল কথায় হইবে না, তখন তিন-চার জন রোজা মিলিয়া, বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে, মৃত্যুঞ্জয় ত মৃত্যুঞ্জয়, সে দিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ধ্বস্তা-ধ্বস্তির পরে, রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি,

সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক্, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাত দিনের বেশি আর বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু এক দিন বলিয়াছিল, ঠাকুর, আমার মাথার দিব্যি রইল, এ সব তুমি আর কখনো ক'রো না।

আমার মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নয়, এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

এক দিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয়ই নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক্, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন, ওই রূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এই মাত্র বলিতে পারি।

খুড়ামশাই ষোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত মৃত্যু হবে, ত হবে কার? পুরুষমানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে যায় না—না হয় একটু নিন্দাই হ'তো। কিন্তু, হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে ম'লো, আমার পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্ন-পাপ! বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে!

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটাও অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায়ই ভাবি, এ অপরাধ হয় ত উহারা দুজনেই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ। তবু এত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী,

ছবি

যে দেশের নর-নারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব্ব, পরাজয়ের ব্যথা, কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব্ব-প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ-ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক Contract তা সে যতই কেন না বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই, মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী—অক্ষয় সতী-লোক তাঁরা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু সেথ সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত, শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয় ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয় ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাঁরা বলিবেন, এই হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলা বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিঁকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়; এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিঁকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু-এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

মামলার ফল

বুড়া বৃন্দাবন সামন্তের মৃত্যুর পরে তাহার দুই ছেলে শিবু ও শম্ভু সামন্ত প্রত্যহ ঝগড়া লড়াই করিয়া মাস-ছয়েক একান্নে এক বাটিতে কাটাইল, তাহার পরে এক দিন পৃথক হইয়া গেল।

গ্রামের জমিদার চৌধুরীমশাই নিজে আসিয়া তাহাদের চাষ-বাস, জমি-জমা, পুকুর-বাগান সমস্ত ভাগ করিয়া দিলেন। ছোট-ভাই সুমুখের পুকুরের ওধারে খান-দুই মাটির ঘর তুলিয়া ছোটবৌ এবং ছেলে-পুলে লইয়া বাস্তু ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

সমস্তই ভাগ হইয়াছিল, শুধু একটা ছোট বাঁশঝাড় ভাগ হইতে পাইল না। কারণ শিবু আপত্তি করিয়া কহিল, চৌধুরী-মশাই, বাঁশঝাড়টা আমার নিতান্তই চাই। ঘরদোর সব পুরানো হয়েছে, চালের বাতা-বাকারি বদ্‌লাতে খোঁটাখুঁটি দিতে বাঁশ আমার নিত্য প্রয়োজন। গাঁয়ে কার কাছে চাইতে যাবো বলুন।

শম্ভু প্রতিবাদের জন্য উঠিয়া বড়ভাইয়ের মুখের উপর হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, ওঁর ঘরের খোঁটাখুঁটিতেই বাঁশ চাই—আর আমার

ধরে কলাগাছ চিরে দিলেই হবে, না? সে হবে না; সে হবে না চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার না থাকলেই চল্‌বে না, তা বলে দিচ্চি।

মীমাংসা ঐ পর্য্যন্তই হইয়া রহিল। সুতরাং সম্পত্তিটা রহিল দুই সরিকের। তাহার ফল হইল এই যে, শম্ভু একটা কঞ্চিতে হাত দিতে আসিলেও শিবু দা লইয়া তাড়িয়া আসে, এবং শিবুর স্ত্রী বাঁশঝাড়ের তলা দিয়া হাঁটিলেও শম্ভু লাঠি লইয়া মারিতে দৌড়ায়।

সে দিন সকালে এই বাঁশঝাড় উপলক্ষ করিয়াই উভয় পরিবারে তুমুল দাঙ্গা হইয়া গেল। ষষ্ঠিপূজা কিংবা এম্‌নি কি একটা দৈব-কার্য্যে বড়বৌ গঙ্গামণির কিছু বাঁশপাতার আবশ্যক ছিল। পল্লী-গ্রামে এ বস্তুটি দুর্ল্লভ নয়, অনায়াসে অন্যত্র সংগ্রহ হইতে পারিত, কিন্তু নিজের থাকিতে পরের কাছে হাত পাতিতে তাঁহার সরম বোধ হইল। বিশেষতঃ তাঁহার মনে ভরসা ছিল, দেবর এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাঠে গিয়াছে—ছোটবৌ একা আর করিবে কি!

কিন্তু কি কারণে শম্ভুর সে দিন মাঠে বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে সবে মাত্র পান্তা-ভাত শেষ করিয়া হাত ধুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এম্‌নি সময়ে ছোটবৌ পুকুর-ঘাট হইতে উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল। শম্ভুর

কোথায় রহিল জলের ঘটি—কোথায় রহিল হাত মুখ ধোওয়া, সে রৈ-রাই শব্দে সমস্ত পাড়াটা তোলপাড় করিয়া তিন লাফে আসিয়া এঁটো-হাতেই পাতা কয়টা কাড়িয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে বড়ভাজের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিল, সে সকল সে আর যেথানেই শিখিয়া থাকুক, রামায়ণের লক্ষ্মণ-চরিত্র হইতে যে শিক্ষা করে নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এদিকে বড়বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি গিয়া মাঠে স্বামীর নিকট খবর পাঠাইয়া দিল। শিবু লাঙল ফেলিয়া কাস্তে হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং বাঁশঝাড়ের অদূরে দাঁড়াইয়া অনুপস্থিত কনিষ্ঠের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ঘুরাইয়া চীৎকার করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইল যে ভিড় জমিয়া গেল। তাহাতেও যখন ক্ষোভ মিটিল না, তখন সে জমীদার-বাড়িতে নালিশ করিতে গেল এবং এই বলিয়া শাসাইয়া গেল যে চৌধুরীমশাই এর বিচার করেন ভালই, না হইলে সে সদরে গিয়া একনম্বর রুজু করিবে—তবে তাহার নাম শিবু সামন্ত।

ওদিকে শম্ভু বাঁশপাতা-কাড়ার কর্ত্তব্যটা শেষ করিয়াই মনের সুখে হাল গরু লইয়া মাঠে চলিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর নিষেধ শুনে নাই। বাটীতে ছোটবৌ একা। ইতিমধ্যে ভাশুর আসিয়া চীৎকারে পাড়া জড় করিয়া বীরদর্পে এক তরফা জয়ী হইয়া

চলিয়া গেলেন; ভাদ্রবধূ হইয়া সে সমস্ত কানে শুনিয়াও একটা কথারও জবাব দিতে পারিল না। ইহাতে তাহার মনস্তাপ ও স্বামীর বিরুদ্ধে অভিমানের অবধি রহিল না। সে রান্নাঘরের দিকেও গেল না। বিরস-মুখে দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

শিবুর বাড়িতেও সেই দশা। বড়বৌ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। হয় সে ইহার একটা বিহিত করুক, নয় সে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে না দিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে। দুটা বাঁশপাতার জন্য দেওরের হাতে এত লাঞ্ছনা!

বেলা দেড় প্রহর হইয়া গেল, তখনও শিবুর দেখা নাই। বড়বৌ ছটফট করিতে লাগিল, কি জানি, চৌধুরীমশাইয়ের বাটী হইতেই বা তিনি নম্বর রুজু করিতে সোজা সদরে চলিয়া গেলেন।

এমন সময় বাহিরের দরজায় ঝনাৎ করিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া শম্ভুর বড়ছেলে গয়ারাম প্রবেশ করিল। বয়স তাহার ষোল-সতেরো, কিংবা এম্‌নি একটা কিছু। কিন্তু এই বয়সেই ক্রোধ এবং ভাষাটা তাহার বাপকেও ডিঙাইয়া গিয়াছিল। সে গ্রামের মাইনর ইস্কুলে পড়ে। আজকাল মর্ণিং-ইস্কুল, বেলা সাড়ে দশটায় ইস্কুলের ছুটী হইয়াছে।

ছবি

গয়ারামের যখন এক বৎসর বয়স, তখন তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তাহার পিতা শম্ভু পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিল বটে, কিন্তু এই মা-মরা ছেলেটিকে মানুষ করিবার দায় জ্যাঠাইমার উপরেই পড়িল এবং এতকাল দুই ভাই পৃথক্ না হওয়া পর্য্যন্ত এ ভার তিনিই বহন করিয়া আসিতেছিলেন। বিমাতার সহিত তাহার কোন দিনই বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না—এমন কি, তাহারা নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাওয়ার পরেও গয়ারাম যেখানে যেদিন সুবিধা পাইত, আহার করিয়া লইত।

আজ সে ইস্কুলের পর বাড়ি ঢুকিয়া বিমাতার মুখ এবং আহারের বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ এবাড়িতে আসিতেছিল। জ্যাঠাইমার মুখ দেখিয়া তাহার সেই আগুনে জল পড়িল না, কেরোসিন পড়িল। সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, ভাত দে জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা কথা কহিলেন না, যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনি বসিয়া রহিলেন।

ক্রুদ্ধ গয়ারাম মাটীতে একটা পা ঠুকিয়া বলিল, ভাত দিবি, না দিবি নে, তা বল্?

গঙ্গামণি সক্রোধে মুখ তুলিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, তোর জন্যে ভাত রেঁধে বসে আছি—তাই দেব। বলি, তোর সৎমা আবাগী ভাত দিতে পারলে না যে এখানে এসেছিস্ হাঙ্গামা কর্‌তে ?

গয়ারাম চেঁচাইয়া বলিল, সে আবাগীর কথা জানি নে। তুই দিবি কি না বল্ ? না দিবি ত চল্লুম, আমি তোর সব হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে দিতে। বলিয়া সে গোলার নিচে চ্যালা-কাঠের গাদা হইতে একটা কাঠ তুলিয়া সবেগে রন্ধনশালার অভিমুখে চলিল।

জ্যাঠাইমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, গয়া! হারামজাদা দস্যি! বাড়াবাড়ি করিস্ নি বল্‌ছি! দুদিন হয় নি আমি নতুন হাঁড়ি-কুঁড়ি কেড়েছি, একটা কিছু ভাঙলে তোর জ্যাঠাকে দিয়ে তোর একখানা পা যদি না ভাঙাই ত তখন বলিস্ হাঁ।

গয়ারাম রান্নাঘরের শিকলটায় গিয়া হাত দিয়াছিল, হঠাৎ একটা নূতন কথা মনে পড়ায় সে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা, ভাত না দিস্ না দিবি ! আমি চাই নে। নদীর ধারে বটতলায় বামুনদের মেয়েরা সব ধামা ধামা চিঁড়ে

মুড়কি নিয়ে পুজো কম্‌চে, যে চাইচে, দিচ্চে, দেখে এলুম। আমি চল্‌লুম তেনাদের কাছে।

গঙ্গামণির তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ অরণ্যষষ্ঠি, এবং এক মুহূর্ত্তেই তাঁহার মেজাজ কড়ি হইতে কোমলে নামিয়া আসিল। তথাপি মুখের জোর রাখিয়া কহিলেন, তাই যা না। কেমন যেতে পাস্ দেখি!

দেখিস্ তখন, বলিয়া গয়া একখানা ছেঁড়া গামছা টানিয়া লইয়া কোমরে জড়াইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই গঙ্গামণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আজ ষষ্ঠির দিনে পরের ঘরে চেয়ে খেলে তোর কি দুর্গতি করি, তা দেখিস্ হতভাগা!

গয়া জবাব দিল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া এক থাম্‌চা তেল লইয়া মাথায় ঘষিতে ঘষিতে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া জ্যাঠাইমা উঠানে নামিয়া আসিয়া ভয় দেখাইয়া কহিলেন, দস্যি কোথাকার! ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে গোঁয়ারতুমি! ডুব দিয়ে ফিরে না এলে ভাল হবে না বলে দিচ্চি। আজ আমি রেগে রয়েচি।

কিন্তু গয়ারাম ভয় পাইবার ছেলে নয়। সে শুধু দাঁত বাহির করিয়া জ্যাঠাইমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গঙ্গামণি তাহার পিছনে পিছনে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠির দিনে কার ছেলে ভাত খায় যে, তুই ভাত খেতে চাস্? পাটালি-গুড়ের সন্দেশ দিয়ে, চাঁপাকলা দিয়ে, দুধ দই দিয়ে ফলার করা চলে না যে, তুই যাবি পরের ঘরে চেয়ে খেতে? কৈবর্ত্তের ঘরে তুমি এম্‌নি নবাব জন্মেছ?

গয়া কিছু দূরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে তুই দিলি নি কেন পোড়ারমুখি? কেন বল্‌লি নেই?

গঙ্গামণি গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন, শোন কথা ছেলের! কখন্ আবার বল্‌লুম তোকে কিছু নেই? কোথায় চান, কোথায় কি, দস্যির মত ঢুকেই বলে দে ভাত। ভাত কি আজ খেতে আছে যে দেব? আমি বলি, সবই ত মজুদ, ডুবটা দিয়ে এলেই—

গয়া কহিল, ফলার তোর পচুক। রোজ রোজ আবাগীরা ঝগড়া ক'রে রান্নাঘরের শেকল টেনে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাক্‌বে, আর রোজ আমি তিনপোর বেলায় ভাতে-ভাত খাবো? যা আমি তোদের কারুর কাছে খেতে চাই নে, বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া গঙ্গামণি সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদ কাঁদ গলায় চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠির দিনে কারো কাছে চেয়ে

খেয়ে অমঙ্গল করিস্ নে গয়া—লক্ষ্মী বাপ আমার—না হয় চারটে পয়সা দেবো রে শোন্—

গয়ারাম ভ্রূক্ষেপও করিল না, দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। বলিতে বলিতে গেল, চাই নে আমি ফলার, চাই নে আমি পয়সা। তোর ফলারে আমি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে, গঙ্গামণি বাড়ি ফিরিয়া রাগে, দুঃখে, অভিমানে নির্জ্জীবের মত দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং গয়ার কুব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার বিমাতার মাথা খাইতে লাগিলেন।

কিন্তু নদীর পথে চলিতে চলিতে গয়ার জ্যাঠাইমার কথাগুলা কানে বাজিতে লাগিল। একে উত্তম আহারের প্রতি স্বভাবতঃই তাহার একটু অধিক লোভ ছিল। পাটালি-গুড়ের সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ, চাঁপাকলা—তাহার উপর চার পয়সা দক্ষিণা—মনটা তাহার দ্রুত নরম হইয়া আসিতে লাগিল।

স্নান সারিয়া গয়ারাম প্রচণ্ড ক্ষুধা লইয়া ফিরিয়া আসিল। উঠানে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, ফলারের সব শিগ্গির নিয়ে আয় জ্যাঠাইমা—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু পাটালি-সন্দেশ কম দিবি ত আজ তোকেই খেয়ে ফেল্‌বো।

গঙ্গামণি সেইমাত্র গরুর কাজ করিতে গোয়ালে ঢুকিয়াছিলেন। গয়ার ডাক শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ঘরে দুধ দই চিঁড়া গুড় ছিল বটে, কিন্তু চাঁপাকলাও ছিল না, পাটালি-গুড়ের সন্দেশও ছিল না। তখন গয়াকে আট্‌কাইবার জন্য যা মুখে আসিয়াছিল, তাই বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিলেন।

তিনি সেইখান হইতে সাড়া দিয়া কহিলেন, তুই ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছাড়্‌ বাবা, আমি পুকুর থেকে হাত ধুয়ে আস্‌চি।

শিগ্‌গির আয়, বলিয়া হুকুম চালাইয়া গয়া কাপড় ছাড়িয়া নিজেই একটা আসন পাতিয়া ঘটিতে জল গড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। গঙ্গামণি তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া আসিয়া তাহার প্রসন্ন মেজাজ দেখিয়া খুসি হইয়া বলিলেন, এই ত আমার লক্ষ্মী ছেলে। কথায় কথায় কি রাগ কর্‌তে আছে বাবা! বলিয়া তিনি ভাঁড়ার হইতে আহারের সমস্ত আয়োজন আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

গয়ারাম চক্ষের পলকে উপকরণগুলি দেখিয়া লইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, চাঁপাকলা কই?

গঙ্গামণি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, ঢাকা দিতে মনে নেই বাবা, সব কটা ইঁদুরে খেয়ে গেছে। একটা বেরাল না পুষলে আর নয় দেখ্‌ছি!

গয়া হাসিয়া বলিল, কলা কখন ইঁদুরে খায়? তোর ছিল না তাই কেন বল্ না?

গঙ্গামণি অবাক্ হইয়া কহিলেন, সে কি কথা রে! কলা ইঁদুরে খায় না?

গয়া চিঁড়া দই মাখিতে মাখিতে বলিল, আচ্ছা, খায়, খায়; কলা আমার দরকার নেই, পাটালি-গুড়ের সন্দেশ নিয়ে আয়। কম আনিস্ নি যেন।

জ্যাঠাইমা পুনরায় ভাঁড়ারে ঢুকিয়া মিছামিছি কিছুক্ষণ হাঁড়ি-কুঁড়ি নাড়িয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, যাঃ—এও ইঁদুরে খেয়ে গেছে বাবা, এক ফোঁটা নেই, কখন মন-ভুলাস্তে হাঁড়ির মুখ খুলে রেখেছি—

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই গয়া চোখ পাকাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, পাটালি-গুড় কখন ইঁদুরে খায় রাক্কুসী—আমার সঙ্গে চালাকি? তোর কিচ্ছু যদি নেই, তবে কেন আমাকে ডাক্লি?

জ্যাঠাইমা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, সত্যি বল্‌চি গয়া—

গয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, তবু বল্‌চ সত্যি, যা—আমি তোর কিচ্ছু খেতে চাই নি, বলিয়া সে পা দিয়া টান মারিয়া সমস্ত

আয়োজন উঠানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি মজা, বলিয়া সে সেই চ্যালা-কাঠটা হাতে তুলিয়া ভাঁড়ারের দিকে ছুটিল।

গঙ্গামণি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া গিয়া পড়িলেন, কিন্তু চক্ষের নিমেষে ক্রুদ্ধ গয়ারাম হাঁড়ি-কুঁড়ি ভাঙিয়া জিনিস-পত্র ছড়াইয়া একাকার করিয়া দিল। বাধা দিতে গিয়া তিনি হাতের উপর সামান্য একটু আঘাত পাইলেন।

ঠিক এমনি সময়ে শিবু জমিদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিল। হাঙ্গামা শুনিয়া চীৎকার-শব্দে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই গঙ্গামণি স্বামীর সাড়া পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং গয়ারাম হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল।

শিবু ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি?

গঙ্গামণি কাঁদিয়া কহিল, গয়া আমার সর্ব্বস্ব ভেঙে দিয়ে হাতে আমার এক ঘা বসিয়ে দিয়ে পালিয়েচে—এই দেখ ফুলে উঠেচে। বলিয়া সে স্বামীকে হাতটা দেখাইল।

শিবুর পশ্চাতে তাহার ছোটসম্বন্ধী ছিল। হুঁসিয়ার এবং লেখাপড়া জানে বলিয়া জমিদার-বাটীতে যাইবার সময় শিবু তাহাকে ও-পাড়া হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কহিল, সামন্ত মশাই

এ সমস্ত ঐ ছোটসামন্তর কারসাজী। ছেলেকে দিয়ে সেই এ কাজ করিয়েছে। কি বল দিদি, এই নয়?

গঙ্গামণির তখন অন্তর জ্বলিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক ভাই। ওই মুখপোড়াই ছোঁড়াকে শিখিয়ে দিয়ে আমাকে মার খাইয়েচে। এর কি করবে তোমরা কর, নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

এত বেলা পর্য্যন্ত শিবুর নাওয়া খাওয়া নাই, জমিদারের কাছেও সুবিচার হয় নাই, তাহাতে বাড়ি পা দিতে না দিতে এই কাণ্ড, তাহার আর হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। সে প্রচণ্ড একটা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চল্লুম থানায় দারোগার কাছে। এর বিহিত না করতে পারি ত আমি বিন্দু সামন্তর ছেলে নই।

তাহার শালা লেখাপড়া-জানা লোক, বিশেষতঃ তাহার গয়ার উপর আগে হইতেই আক্রোশ ছিল, সে কহিল, আইন মতে এর নাম অনধিকার প্রবেশ। লাঠি নিয়ে বাড়ি চড়াও হওয়া, জিনিস-পত্র ভাঙা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা—এর শাস্তি ছমাস জেল। সামন্তমশাই, তুমি কোমর বেঁধে দাঁড়াও দেখি, আমি কেমন না বাপ-বেটাকে একসঙ্গে জেলে পুরতে পারি।

শিবু আর দ্বিরুক্তি করিল না, সম্বন্ধীর হাত ধরিয়া থানায় দারোগার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

গঙ্গামণির সকলের চেয়ে বেশি রাগ পড়িয়াছিল, দেবর ও ছোট-বধূর উপর। সে এই লইয়া একটা হুলস্থুল করিবার উদ্দেশ্যে কবাটে শিকল তুলিয়া দিয়া সেই চ্যালা কাঠ হাতে করিয়া সোজা শম্ভুর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। উচ্চকণ্ঠে কহিল, কেমন গো ছোট-কর্ত্তা, ছেলেকে দিয়ে আমাকে মার খাওয়াবে? এখন বাপ-বেটায় একসঙ্গে ফাটকে যাও।

শম্ভু সেই মাত্র তাহার এ পক্ষের ছেলেটাকে লইয়া ফলার শেষ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বড়ভাজের মূর্ত্তি এবং তাহার হাতের চ্যালা-কাঠটা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কহিল, হয়েছে কি? আমি ত কিছুই জানি নে!

গঙ্গামণি মুখ বিকৃত করিয়া জবাব দিল, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। দারোগা আস্‌চে, তার কাছে গিয়ে ব'লো, কিছুই জান কি না?

ছোটবৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া একটা খুঁটি ঠেস্ দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল, শম্ভু মনে মনে ভয় পাইয়া কাছে আসিয়া গঙ্গামণির একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, মাইরি বল্‌ছি বড়বৌঠান, আমরা কিছুই জানি নে।

কথাটা যে সত্য, বড়বৌ তাহা নিজেও জানিত, কিন্তু তখন উদারতার সময় নয়। সে শম্ভুর মুখের উপরেই ষোল আনা দোষ চাপাইয়া—সত্য মিথ্যায় জড়াইয়া গয়ারামের কীর্ত্তি বিবৃত করিল। এই ছেলেটাকে যাহারা জানে, তাহাদের পক্ষে ঘটনাটা অবিশ্বাস করা শক্ত।

স্বল্পভাষিণী ছোটবৌ এতক্ষণে মুখ খুলিল; স্বামীকে কহিল, ক্যামন, যা বলেছিনু তাই হল কি না—কত দিন বলি, ওগো দস্যি ছোঁড়াটাকে আর ঘরে ঢুকতে দিয়ো নি, তোমার ছোটছেলেটাকে হক্ না-হক্ মেরে মেরে কোন্ দিন খুন করে ফেল্‌বে। তা গেরাহ্যিই হয় না—এখন কথা খাটলো ত?

শম্ভু অনুনয় করিয়া গঙ্গামণিকে কহিল, আমার দিব্যি বড়-বৌঠান, দাদা সত্যি না কি থানায় গেছে।

তাহার করুণ কণ্ঠস্বরে কতকটা নরম হইয়া বড়বৌ জোর দিয়া বলিল, তোমার দিব্যি ঠাকুরপো গেছে, সঙ্গে আমাদের পাঁচুও গেছে।

শম্ভু অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। ছোটবৌ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, নিত্যি বলি দিদি, কোথায় যে নদীর ওপর সরকারী পুল হচ্ছে, কত লোক খাটতে যাচ্ছে, সেথায় নিয়ে গিয়ে

ওরে কাজে লাগিয়ে দাও। তারা চাবুক মারবে আর কাজ করাবে —পালাবার যোটি নেই—দুদিনে সোজা হয়ে যাবে। তা না— ইস্কুলে দিয়েচি পড়ুক। ছেলে যেন ওঁর উকিল মোক্তার হবে!

শম্ভু কাতর হইয়া বলিল, আরে সাধে দিই নি সেখানে! সবাই কি ঘরে ফিরতে পায়—অদ্ধেক লোক মাটি চাপা হয়ে কোথায় তলিয়ে যায়, তার তল্লাসই মেলে না।

ছোটবৌ বলিল,তবে বাপ-ব্যাটাতে মিলে ফাটকে খাটগে যাও।

বড়বৌ চুপ করিয়া রহিল। শম্ভু তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, আমি কালই ছোঁড়াকে নিয়ে গিয়ে পাঁচরার পুলে কাজে লাগিয়ে দেব, বৌঠান, দাদাকে ঠাণ্ডা কর। আর এমন হবে না।

তাহার স্ত্রী কহিল, ঝগড়া-ঝাঁটি ত শুধু ঐ ড্যাক্‌রার জন্যে। তোমাকেও ত কতবার বলিচি দিদি, ওরে ঘরে দোরে ঢুকতে দিয়ো না—আস্কারা দিয়ো না। আমি বলি নে তাই; নইলে ও-মাসে তোমাদের মর্ত্তমান কলার কাঁদিটে রাত্তিরে কে কেটে নিয়েছিল? সে ত ঐ দস্যি। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হ'লে কি চলে? পুলের কাজে পাঠিয়ে দাও, পাড়া জুড়ুক?

শম্ভু মাতৃদিব্য করিল যে, কাল যেমন করিয়া হোক্ ছোঁড়াকে গ্রাম ছাড়া করিয়া তবে সে জল-গ্রহণ করিবে।

গঙ্গামণি এ কথাতেও কোন কথা কহিল না, হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

স্বামী, ভাই, এখনও অভুক্ত। অপরাহ্ণ-বেলায় সে বিষণ্ণ-মুখে রান্নাঘরের দোরে বসিয়া তাহাদেরই খাবার আয়োজন করিতেছিল, গয়ারাম উঁকি ঝুঁকি মারিয়া নিঃশব্দ পদে প্রবেশ করিল। বাটীতে আর কেহ নাই দেখিয়া সে সাহসে ভর করিয়া একেব... পিছনে আসিয়া ডাক দিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। ...াম অদূরে ক্লান্তভাবে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, আছ... া আছে তাই দে, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

খাবার কথায় গঙ্গামণির শান্ত ক্রোধ মুহূর্ত্তে প্র...ত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার মুখের প্রতি না চ...ই সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া! পোড়ারমুখো! আবার আমার কাছে এসেছিস ক্ষিদে বলে? দূর হ এখান থেকে।

গয়া কহিল, দূর হব তোর কথায়?

জ্যাঠাইমা ধমক দিয়া কহিলেন, হারামজাদা, নচ্ছার! আমি আবার দেবো তোকে খেতে?

গয়া বলিল, তুই দিবি নি ত কে দেবে? কেন তুই ইঁদুরের দোষ

দিয়ে মিছে কথা বল্‌লি ? কেন ভাল করে বল্‌লি নি,বাবা, এই দিয়ে খা, আজ আর কিছু নেই! তা বলে ত আমার রাগ হয় না। দে না খেতে শিগ্‌গির রাক্ষুসী, আমার পেট যে জ্বলে গেল!

জ্যাঠাইমা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, মনে মনে একটু নরম হইয়া বলিলেন, পেট জ্বলে থাকে তোর সৎমার কাছে যা।

বিমাতার নামে গয়া চক্ষের পলকে আগুন হইয়া উঠিল। বলিল সে অবাগীর না কি আমি আর মুখ দেখ্‌বো ? শুধু ঘরে আমার ছিপ্‌টা আনতে গেছি, বলে দূর! দূর! এইবার জেলের ভাত খেগে যা! আমি বললুম, তোদের ভাত আমি খেতে আসি নি— আমি জ্যাঠাইমার কাছে যাচ্চি। পোড়ারমুখী কম শয়তান! ঐ গিয়ে লাগিয়েচে বলেই ত বাবা তোর হাত থেকে বাঁশ-পাতা কেড়ে নিয়েচে! বলিয়া সে সজোরে মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া কহিল, তুই রাক্ষসী নিজে পাতা আন্‌তে গিয়ে অপমান হ'লি ; কেন আমায় বল্‌লি নি ? ঐ বাঁশঝাড় সমস্ত আমি যদি না আগুন দিয়ে পোড়াই ত আমার নাম গয়া নয়, তা দেখিস্‌! আবাগী আমাকে বল্‌লে কি জানিস্‌ জ্যাঠাইমা ? বলে তোর জ্যাঠাইমা থানায় খবর পাঠিয়েচে, দারোগা এসে বেঁধে নিয়ে তোকে জেল দেবে। শুন্‌লি কথা হতভাগীর ?

গঙ্গামণি কহিলেন, তোর জ্যাঠামশাই পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেই ত থানায়। তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্—এত বড় তোর আস্পদ্দা?

পাঁচুমামাকে গয়া একেবারে দেখিতে পারিত না। সে আবার যোগ দিয়াছে শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কেন তুই রাগের সময় আমাকে আট্‌কাতে গেলি?

গঙ্গামণি বলিলেন, তাই আমাকে মার্‌বি? এখন যা ফাটকে বাঁধা থাক্ গে যা।

গয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, ইঃ—তুই আমাকে ফাটকে দিবি? দে না, দিয়ে একবার মজা দেখ্ না! আপনিই কেঁদে কেঁদে মরে যাবি—আমার কি হবে!

গঙ্গামণি কহিলেন, আমার ব'য়ে গেছে কাঁদ্‌তে। যা, আমার সুমুখ থেকে যা বল্‌চি, শত্তুর বালাই কোথাকার।

গয়া চেঁচাইয়া কহিল, তুই আগে খেতে দে না তবে ত যাবো। কথন্ সাত সকালে দুটি মুড়ি খেয়েচি বল্ ত? ক্ষিদে পায় না আমার?

গঙ্গামণি কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শিবু পাঁচুকে লইয়া থানা হইতে ফিরিয়া আসিল এবং গয়ার প্রতি চোখ

পড়িবামাত্রই বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিল, হারামজাদা পাজী আবার আমার বাড়ি ঢুকেছে! বেরো, বেরো বল্‌ছি! পাঁচু ধর্‌ ত শূয়োরকে!

বিদ্যুদ্বেগে গয়ারাম দরজা দিয়া দৌড় মারিল! চেঁচাইয়া বলিয়া গেল—পেঁচোশালার একটা ঠ্যাং না ভেঙে দিই ত আমার নামই গয়ারাম নয়!

চক্ষের পলকে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। গঙ্গামণি একটা কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না।

ক্রুদ্ধ শিবু স্ত্রীকে বলিল, তোর আস্কারা পেয়েই ও এমন হচ্চে। আর যদি কখন হারামজাদাকে বাড়ি ঢুক্‌তে দিস্‌ ত তোর অতি বড় দিব্যি রইল।

পাঁচু বলিল, দিদি, তোমাদের কি, আমারই সর্ব্বনাশ। কখন রাত-ভিতে লুকিয়ে আমার ঠ্যাঙেই ও ঠ্যাঙা মারবে দেখ্‌চি।

শিবু কহিল, কাল সকালেই যদি না পুলিশ পেয়াদা দিয়ে ওর হাতে দড়ি পরাই ত আমার—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

গঙ্গামণি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ভীতু পাঁচকড়ি সে রাত্রে আর বাড়ি গেল না। এইখানে শুইয়া রহিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় ক্রোশ-দুই দূরের পথ হইতে দারোগাবাবু উপযুক্ত দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া পাল্কী চড়িয়া কনেষ্টবল ও চৌকিদারাদি সমভিব্যাহারে সরজমিনে তদন্ত করিতে উপস্থিত হইলেন। অনধিকার প্রবেশ, জিনিস-পত্র তছ্‌রুপাত, চ্যালা-কাঠের দ্বারা স্ত্রীলোকের অঙ্গে প্রহার—ইত্যাদি বড় বড় ধারার অভিযোগ—সমস্ত গ্রামময় একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল!

প্রধান আসামী গয়ারাম—তাহাকে কৌশলে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিতেই, সে কনেষ্টবল, চৌকিদার প্রভৃতি দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে কেউ দেখ্‌তে পারে না ব'লে আমাকে ফাটকে দিতে চায়। দারোগা বুড়ামানুষ। তিনি আসামীর বয়স এবং কান্না দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কেউ ভালবাসে না গয়ারাম?

গয়া কহিল, আমাকে শুধু আমার জ্যাঠাইমা ভালবাসে, আর কেউ না।

দারোগা প্রশ্ন করিল, তবে জ্যাঠাইমাকে মেরেচ কেন?

গয়া বলিল, না, মারি নি। কবাটের আড়ালে গঙ্গামণি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া কহিল, তোকে আমি কখন্‌ মেরেচি জ্যাঠাইমা?

পাঁচু নিকটে বসিয়াছিল, সে একটু কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, দিদি, হুজুর জিজ্ঞেসা কর্‌চেন সত্যি কথা বল। ও কাল দুপুর-বেলা বাড়ি চড়াও হ'য়ে—কাঠের বাড়ি তোমাকে মারেনি ? ধর্ম্মাবতারের কাছে যেন মিথ্যা কথা ব'ল না।

গঙ্গামণি অস্ফুটে যাহা কহিলেন, পাঁচু তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিল, হাঁ হুজুর, আমার দিদি বল্‌চেন, ও মেরেচে।

গয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ছাখ্ পেঁচো, তোর আমি না পা ভাঙি ত—রাগে কথাটা তার সম্পূর্ণ হইতে পাইল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঁচু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, দেখ্‌লেন হুজুর! দেখ্‌লেন! হুজুরের সুমুখেই বল্‌ছে পা ভেঙে দেবে—আড়ালে ও খুন কর্‌তে পারে। ওকে বাঁধবার হুকুম হোক্।

দারোগা শুধু একটু হাসিলেন। গয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমার মা নেই তাই! নইলে—এ বারেও কথাটা তাহার শেষ হইতে পারিল না। যে মাকে তাহার মনেও নাই, মনে করিবার কখনও প্রয়োজনও হয় নাই, আজ বিপদের দিনে অকস্মাৎ তাঁহাকেই ডাকিয়া সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় আসামী শম্ভুর বিরুদ্ধে কোন কথাই প্রমাণ হইল না।

দারোগাবাবু আদালতে নালিশ করিবার হুকুম দিয়া রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচু মাম্‌লা চালানো, তাহার যথারীতি তদ্বিরাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং তাহার ভগিনীর প্রতি গুরুতর অত্যাচারের জন্য গয়ার যে কঠিন শাস্তি হইবে, এই কথা চতুর্দ্দিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু গয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। পাড়া-প্রতিবেশীরা শিবুর এই আচরণে নিন্দা করিতে লাগিল। শিবু তাহাদের সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু শিবুর স্ত্রী একেবারে চুপচাপ! সে দিন গয়ার দূর-সম্পর্কের এক মাসি খবর শুনিয়া শিবুর বাড়ি বহিয়া তাহার স্ত্রীকে যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গালিগালাজ করিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গামণি একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। শিবু পাশের বাড়ির লোকের কাছে এ কথা শুনিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীকে কহিল, তুই চুপ করে রইলি? একটা কথাও বল্‌লি নে?

শিবুর স্ত্রী কহিল, না।

শিবু বলিল, আমি বাড়ি থাকলে মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করে ছেড়ে দিতুম।

তাহার স্ত্রী কহিল, তা হ'লে আজ থেকে বাড়িতেই ব'সে থেকো, আর কোথাও বেরিও না। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সে দিন দুপুর-বেলায় শিবু বাড়ি ছিল না। শম্ভু আসিয়া বাঁশ-ঝাড় হইতে গোটা-কয়েক বাঁশ কাটিয়া লইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া শিবুর স্ত্রী বাহিরে আসিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিল। কিন্তু বাধা দেওয়া দূরে থাকুক আজ সে কাছেও ঘেঁষিল না, নিঃশব্দে ঘরে ফিরিয়া গেল। দিন-দুই পরে সংবাদ শুনিয়া শিবু লাফাইতে লাগিল। স্ত্রীকে আসিয়া কহিল, তুই কি কানের মাথা খেয়েছিস্? ঘরের পাশ থেকে সে বাঁশ কেটে নিয়ে গেল, আর তুই টের পেলি নি?

তাহার স্ত্রী বলিল, কেন টের পাব না, আমি চোখেই ত সব দেখিচি!

শিবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তবু আমাকে তুই জানালি নে?

গঙ্গামণি বলিল, জানাবো আবার কি? বাঁশ-ঝাড় কি তোমার একার? ঠাকুরপোর তাতে ভাগ নেই?

শিবু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া শুধু কহিল, তোর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে?

সে দিন সন্ধ্যার পর পাঁচু সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রান্ত-ভাবে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। শিবু গরুর জন্য খড় কুচাইতেছিল, অন্ধকারে তাহার মুখের চোখের চাপা হাসি লক্ষ্য করিল না—সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো?

পাঁচু গাম্ভীর্য্যের সহিত একটু হাস্য করিয়া কহিল, পাঁচু থাক্‌লে যা হয় তাই! ওয়ারিণ্ট বের করে তবে আস্‌চি। এখন কোথায় আছে জান্‌তে পার্‌লেই হয়।

শিবুর কি একপ্রকার ভয়ানক জিদ্ চড়িয়া গিয়াছিল। সে কহিল, যত খরচ হোক্ ছোঁড়াকে ধরাই চাই। তাকে জেলে পূরে তবে আমার অন্য কাজ। তার পরে উভয়ের নানা পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল, ভিতর হইতে আহারের আহ্বান আসে না দেখিয়া শিবু আশ্চর্য্য হইয়া রান্নাঘরে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্ত্রী মেজের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে। ক্রুদ্ধ এবং আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাবার হ'য়ে গেছে ত আমাদের ডাকাস নি কেন?

গঙ্গামণি ধীরে সুস্থে পাশ ফিরিয়া বলিল, কে রাঁধলে যে খাবার হ'য়ে গেছে?

শিবু তর্জ্জন করিয়া প্রশ্ন করিল, রাঁধিস্ নি এখনো?

গঙ্গামণি কহিল, না। আমার শরীর ভাল নেই, আজ আমি পারব না। নিদারুণ ক্ষুধায় শিবুর নাড়ী জলিতেছিল, সে আর সহিতে পারিল না। শায়িত স্ত্রীর পিঠের উপর একটা লাথি

মারিয়া বলিল, আজকাল রোজ অসুখ, রোজ পারব না! পারবি নে ত বেরো আমার বাড়ি থেকে।

গঙ্গামণি কথাও কহিল না, উঠিয়াও বসিল না। যেমন শুইয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল। সে রাত্রে শালা ভগিনীপতি কাহারও খাওয়া হইল না।

সকাল-বেলা দেখা গেল, গঙ্গামণি বাটীতে নাই। এদিকে ওদিকে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পাঁচু কহিল, দিদি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি চলে গেছে।

স্ত্রীর এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু শিবু মনে মনে বুঝিয়াছিল বলিয়া তাহার বিরক্তিও যেমন উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, নালিশ মকদ্দমার প্রতি ঝোঁকও তেমনি খাটো হইয়া আসিতেছিল। সে শুধু বলিল, চুলোয় যাক্, আমার খোঁজবার দরকার নেই।

বিকেল-বেলা খবর পাওয়া গেল, গঙ্গামণি বাপের বাড়ি যায় নাই। পাঁচু ভরসা দিয়া কহিল, তা হ'লে নিশ্চয় পিসিমার বাড়ি চ'লে গেছেন।

তাহাদের এক বড়লোক পিসি ক্রোশ পাঁচ-ছয় দূরে একটা গ্রামে বাস করিতেন। পূজা পর্ব্ব উপলক্ষে তিনি মাঝে মাঝে গঙ্গামণিকে লইয়া যাইতেন। শিবু স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

সে মুখে বলিল বটে, যেখানে খুসি যাক্ গে! মরুক্ গে! কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনুতপ্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তবুও রাগের উপর দিন পাঁচ-ছয় কাটিয়া গেল। এদিকে কাজ-কর্ম্ম লইয়া, গরু-বাছুর লইয়া সংসার তাহার একপ্রকার অচল হইয়া উঠিল। একটা দিনও আর কাটে না এম্নি হইল।

সাত দিনের দিন সে আপনি গেল না বটে, কিন্তু নিজের পৌরুষ বিসর্জ্জন দিয়া, পিসির বাড়িতে গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিল।

পর দিন শূন্য গাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সেখানে কেহ নাই। শিবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সারাদিন স্নানাহার নাই, মড়ার মত একটা তক্তাপোষের উপর পড়িয়াছিল, পাঁচু অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সামন্তমশাই, সন্ধান পাওয়া গেছে!

শিবু ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কোথায়? কে খবর দিলে? অসুখ বিসুখ কিছু হয় নি ত? গাড়ী নিয়ে চল্ না এখুনি দুজনে যাই।

পাঁচু বলিল, দিদির কথা নয়—গয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে!

শিবু আবার শুইয়া পড়িল, কোন কথা কহিল না।

তখন পাঁচু বহুপ্রকারে বুঝাইতে লাগিল যে এ সুযোগ কোনও

মতে হাতছাড়া করা উচিত নয়। দিদি ত এক দিন আস্‌বেই, কিন্তু তখন আর এ ব্যাটাকে বাগে পাওয়া যাবে না। শিবু উদাসকণ্ঠে কহিল, এখন থাক্ গে পাঁচু! আগে সে ফিরে আসুক তার পরে—

পাঁচু বাধা দিয়া কহিল, তার পরে কি আর হবে সামন্তমশাই? বরঞ্চ দিদি ফিরে আস্‌তে না আস্‌তে কাজটা শেষ করা চাই। সে এসে পড়লে হয় ত আর হবেই না।

শিবু রাজি হইল। কিন্তু আপনার খালি ঘরের দিকে চাহিয়া পরের উপর প্রতিশোধ লইবার জোর আর সে কোন মতে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এখন পাঁচুর জোর ধার করিয়াই তাহার কাজ চলিতেছিল।

পর দিন রাত্রি থাকিতেই [illegible] আদালতের পেয়াদা প্রভৃতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথে [illegible] বহু দুঃখে খবর পাওয়া গেছে, শম্ভু তাহাকে পাঁচলা[illegible]ী পুলের কাজে নাম ভাঁড়াইয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে—সেইখানে [illegible] তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

শিবু বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, তখনও চুপ করিয়া রহিল।

তাহারা গ্রামে যখন প্রবেশ করিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। গ্রামের

ছবি

এক প্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠ, লোক-জন, লোহা-লক্কড়, কল-কারখানায় পরিপূর্ণ—সর্ব্বত্রই ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া জন-মজুরেরা বা[illegible] করিতেছে—অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর একজন কহিল, যে [illegible]লেটি সাহেবের বাঙ্‌লা লেখাপড়ার কাজ করচে, সে ত? তার ঘর ঐ যে, বলিয়া একখানা ক্ষুদ্র কুটীর দেখাইয়া দিলে, তাহারা গুঁড়ি মারিয়া পা টিপিয়া অনেক কষ্টে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে [illegible]রামের গলা শুনিতে পাওয়া গেল। পাঁচুপুলকে উল্লসিত হইয়া পেঁয়াদা এবং শিবুকে লইয়া বীরদর্পে অকস্মাৎ কুটীরের উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইবামাত্রই তাহার সমস্ত মুখ বিস্ময়ে, ক্ষোভে, নিরাশায় কালো হইয়া গেল। তাহার দিদি ভাত বাড়িয়া দিয়া একটা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছে এবং গয়ারাম ভোজনে বসিয়াছে।

শিবুকে দেখিতে পাইয়া গঙ্গামণি মাথায় আঁচলটা তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, তোমরা এ[illegible] জিরিয়ে নিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসো গে আমি ততক্ষণ আ[illegible] এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দিই।

সম্পূর্ণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা